বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ২০৭-২১৪
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশে ভাবনা: ভাবনায় অর্থনীতি

মোঃ মোস্তফা কামাল*

সারসংক্ষেপ *১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা পেরিয়ে এসেছি ৫০ বছর, পৌঁছে গেছি এর সুবর্ণজয়ন্তীতে। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল শোষণমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠা করা, যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, আত্মনির্ভরশীল এবং সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলা। জাতির পিতার অবর্তমানে বাংলাদেশ পার করেছে দীর্ঘ ৪৫টি বছর। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কৃতি এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি অনেক দূর এগিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস। অর্থনৈতিক উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ আজ বিশ্বের রোল মডেল। কিন্তু কোনো এক অদৃশ্য শক্তির যাঁতাকালে স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও প্রতিষ্ঠিত হয়নি বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সেই সোনার বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বর্তমান আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং ভবিষ্যতে সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত উন্নয়ন অগ্রযাত্রার প্রয়াস রয়েছে বর্তমান প্রবন্ধে।*

মূল শব্দ *সুবর্ণজয়ন্তী · রোল মডেল · সামাজিক বৈষম্য · অর্থনৈতিক মুক্তি · কৃষকের অবস্থা · প্রকৃত উন্নয়ন · প্রকৃত ক্ষুধামুক্ত*

"মানুষে মানুষে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য বিলোপ করিবার জন্য, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করিবার জন্য এবং প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমান স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সুষম সুযোগ-সুবিধাদান নিশ্চিত করিবার জন্য রাষ্ট্র কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।"[১] ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তানি দুঃশাসন, বঞ্চনা আর চরম অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য থেকে মুক্তির লক্ষ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের জন্ম হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হইবে মেহনতি মানুষকে-কৃষক ও শ্রমিককে এবং জনগণের অনগ্রসর অংশসমূহকে সকল প্রকার শোষণ হইতে মুক্তি দান করা।"

ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনায় এখানে আমরা এক বিরাট স্বপ্ন দেখতে পারি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। একটিকে ছাড়া অন্যটি কল্পনা করা যায় না। একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি

* প্রভাষক (খণ্ডকালীন), অর্থনীতি বিভাগ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা।
মোবাইল ফোন: ০১৭৫৩৫৭৫৮৫২ ই-মেইল: mostofajnu1988@gmail.com

১ বাংলাদেশ সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৯, ধারা-০২

অর্থবহ হয় না। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির মতোই একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয় সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে। সুশাসন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। একটিকে বাদ দিলে অন্যটি হয়ে যায় তেলবিহীন ইঞ্জিনের মতো। মুক্তিযুদ্ধের পর আমরা পেরিয়ে এসেছি পঞ্চাশ বছর, পৌঁছে গেছি এর সুবর্ণজয়ন্তীতে। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন সম্ভব হয়নি। সবাই চায়—আগামীর বাংলাদেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে অর্জিত হবে অর্থনৈতিক মুক্তিও। মুছে যাবে কৃষক-শ্রমিক আর মেহনতি মানুষের বঞ্চনার ইতিহাস।

মানুষের মৌলিক অধিকারের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলো খাদ্য। বাংলাদেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু প্রকৃত ক্ষুধামুক্তি এখনো সম্ভব হয়নি। আজও বাংলার আকাশে শোনা যায় ক্ষুধার্ত মানুষের আহাজারি। এমন বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে ক্ষুধার জন্য কোনো হাহাকার শোনা যাবে না। সবাই দু-বেলা শান্তিতে পেটপুরে খেতে পারবে। ক্ষুধা নিবারণের জন্য পর্যাপ্ত খাদ্য ঠিকই আমাদের আছে। কিন্তু রয়েছে অব্যবস্থাপনা, সঠিক বণ্টনের অভাব। অভিজাত শ্রেণি নিজেদের বিলাসিতার কারণে যে খাদ্য অপচয় করে, যা দিয়ে কষ্টে থাকা মানুষের পেটের ক্ষুধা নিবারণ সম্ভব। আগামীর বাংলাদেশ হবে প্রকৃত ক্ষুধামুক্ত এবং দারিদ্র্যমুক্ত এমনই স্বপ্ন সবার। কৃষিই বাংলাদেশের প্রাণ, কৃষিই এ দেশের অর্থনীতির মেরুদণ্ড। একসময় এ দেশের কৃষকের ছিল গোলাভরা ধান আর গোয়ালভরা গরু। আজ সেই কৃষি আর কৃষক নানা সমস্যায় জর্জরিত। মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্যের কারণে কৃষকের অবস্থা আজ শোচনীয়। সবার আশা—আগামীর বাংলাদেশে কৃষি আর কৃষকের সেই সমস্যা কেটে গিয়ে কৃষি ফিরে পাবে তার আপন গতি, কৃষক পাবে তার কষ্টার্জিত ফসলের ন্যায্যমূল্য। কৃষকের ঘরে ঘরে উঠবে ধান, নবান্নের উৎসবে ভরে উঠবে বাংলার প্রতিটি ঘর। বাঙালি পরিচিতি পাবে দুধে-ভাতে বাঙালি হিসেবে।

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী। এ জন্য বাংলাদেশ নদীমাতৃক বাংলাদেশ হিসাবেই পরিচিত। স্বাভাবিকভাবেই এ দেশের মানুষ পরিচিতি পেত মাছে-ভাতে বাঙালি হিসাবে। বাঙালির সেই চিরায়ত ঐতিহ্য আজ বিলিন হওয়ার পথে। খালবিল ভরাট করে চলছে স্থাপনা তৈরির মহোৎসব। অবৈধ দখল আর নদ-নদীভরাটের উৎসবের কারণে নদ-নদীর আজ ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা। নদীতে চলছে মাত্রাতিরিক্ত দূষণ আর নাব্য সংকট। অপরিকল্পিত নগরায়ণ, শিল্পায়ন ও জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে অপরিকল্পিত বাসস্থান তৈরি নদী খাল-বিলের ওপর ভয়ঙ্কর থাবা বিস্তার করছে। নদীর উপর অপরিকল্পিত বাঁধ দিয়ে ব্রিজ-সেতু নির্মাণের ফলে নদ-নদী হারাতে বসেছে তার স্বাভাবিক প্রবাহ। যেসব খাল-বিল-নদী অবশিষ্ট রয়েছে, সেগুলোতে দূষণের মাত্রা এত বেশি যে মাছের পক্ষে বেঁচে থাকা কঠিন। কৃষিজমিতে মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশকের ব্যবহারসহ নানা কারণে হুমকির মুখে পড়েছে জীববৈচিত্র্য। আমরা এমন এক বাংলাদেশ দেখতে চাই, যেখানে কেউ নদী আর খাল ভরাটে লিপ্ত হবে না। হারানো নদীগুলো পুনরুদ্ধার হবে, নদীর নাব্য বৃদ্ধি পাবে, দূষণরোধ আর জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের মাধ্যমে নদী ফিরে পাবে তার আপন গতি, জেলেরা সুদিন ফিরে পাবে, মৎস্য খাত মজবুত করবে বাংলাদেশের অর্থনীতির ভিত। সর্বোপরি বাঙালি প্রকৃত অর্থেই মাছে-ভাতে বাঙালি হিসেবে পরিচিতি পাবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে।

বছর ঘুরে বাঙালির কাছে ফিরে আসে নববর্ষ। এ যেন বাঙালির নতুন জীবনে প্রবেশ করার-নতুন করে প্রাণ ফিরে পাওয়ার এক মূলমন্ত্র। কিন্তু আজকের দিনে নববর্ষ যেনো শহুরে ধনিকশ্রেণির ভোগবিলাস আর বছরওয়ারি পান্তা-ইলিশের আয়োজনে পরিণত হয়েছে। এখানেই আমরা স্বপ্ন দেখি, আগামীর বাংলাদেশে বাঙালির ঘরে ঘরে বছরজুড়ে ছড়াবে ইলিশের গন্ধ। জাতি-ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সবাই নববর্ষের আনন্দের সমান অংশীদার হবে। নববর্ষ শুধু উৎসবের একটি দিনই নয়, এটি আমাদের বাঙালি সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য

অংশ—এটাই জাগ্রত হবে সবার মানসপটে। নববর্ষের সাথে আমাদের অর্থনীতির একটি সুদৃঢ় মেলবন্ধন রয়েছে। আগে নববর্ষের দিন দোকানিরা হালখাতার আয়োজন করত। দোকানি ক্রেতাকে মিষ্টিমুখ করাত। আর ক্রেতা তার পুরোনো হিসাব চুকিয়ে নতুন করে আবার নববর্ষের খাতায় নিজের নাম যুক্ত করত। এটি আর আজ সর্বত্র দেখা যায় না। ঋণ-ধার-দেনা পরিশোধের ক্ষেত্রে নববর্ষ হতে পারে আমাদের জন্য পাথেয়। বাংলাদেশে নববর্ষের সেই ঐতিহ্য আবার সেই চিরায়ত রূপ ধারণ করবে, নববর্ষের মাধ্যমে বাংলার অর্থনীতি ফিরে পাবে নতুন প্রাণ এমনই প্রত্যাশা সবার।

আমাদের রয়েছে ১৮ কোটির (প্রায়) প্রাণ সম্পদ। যেকোনো দেশের জনসংখ্যাই যেন খনির আকরের মণির মতো, এটিকে সুষ্ঠু ব্যবহার না করলে তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট (জনমিতিক লভ্যাংশ) এর যুগে এসে পৌঁছেছে। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আগামীর বাংলাদেশে ১৮ কোটি জনসংখ্যা দক্ষ মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে—গড়ে উঠবে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এমনটাই প্রত্যাশা।

একসময় বাংলাদেশকে কথিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। বাংলাদেশ সেই তিক্ততার ইতিহাস পেরিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের যে অর্থনৈতিক অগ্রগতি তা সত্যিই প্রশংসার দাবিদার। ভবিষ্যতের বাংলাদেশ এই অগ্রগতিকে অব্যাহত রেখে একটি উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশে রূপান্তরিত হবে, সবাই উন্নত জীবন পাবে- বিশ্ব ইতিহাসে বাংলাদেশ হবে উন্নয়নের রোল মডেল এমনই এক স্বপ্ন সবার। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনীতি এগিয়ে যাবে তার কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে। ভবিষ্যতে কোনো রাজনৈতিক দল লোকদেখানো রাজনীতির নামে, নিজেদের স্বার্থোদ্ধারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আর বিপর্যস্ত করবে না, সেই স্বপ্নই আমরা দেখতে চাই।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন "যে দেশে ধর্মের মিলেই প্রধানত মানুষকে মেলায়, অন্য কোনো বাঁধনে তাকে বাঁধতে পারে না, সে দেশ হতভাগ্য। যে দেশ ধর্মকে দিয়ে বিভেদ সৃষ্টি করে সেটাই সর্বনাশা বিভেদ। মানুষ বলেই মানুষের যে মূল্য সহজপ্রীতির সঙ্গে স্বীকার করাই প্রকৃত ধর্মবুদ্ধি।" আজ এ কথা মানতেই হবে, এক অশুভ সর্বনাশা 'ধর্মাশ্রয়ী রাজনীতি' দিয়ে পরিচালিত হচ্ছে আমাদের এই বাংলাদেশ। এ যেন নতুন রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের উত্থান। ১৯৭২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি সেক্যুলার (ধর্মনিরপেক্ষ) রাষ্ট্র হিসেবে। ১৯৭৭-১৯৮৮ সময়কালে সংবিধানের বুকে চাকু মেরে তাকে রাষ্ট্রধর্ম বানানোর সিঁড়ি তৈরি করা হয়েছে। সংবিধানে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম" যুক্ত করে রক্ষণশীল জাতীয়তাবাদের বীজ বপণ করা হয়েছে, তৈরি করা হয়েছে সংখ্যাগুরুর 'শ্যাবিজম'। বাংলাদেশে ধর্মীয় জাতিগত সংখ্যালঘুদের স্বার্থ ও অধিকার রক্ষায় বেশ খানিকটা অগ্রগতি হলেও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী অবস্থান থেকে ধর্মীয় ও জাতিগত সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন-বৈষম্য অব্যাহত আছে। এখানেই আমরা স্বপ্ন দেখি—ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সেই অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ, যেখানে সবাই পরিচিত হবে বাঙালি হিসেবে, সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরুর ভিত্তিতে নয়। সেখানে সবার জন্য শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত হবে, অশুভ ধর্মকেন্দ্রিকতার বৃত্ত ভেঙে যাবে, ধর্মীয় উগ্রবাদ-সন্ত্রাসের নামে বাংলার অর্থনীতি ধ্বংস হবে না।

বাংলাদেশের রয়েছে সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ইতিহাস। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের যৌথ প্রয়াসেই প্রকৃত উন্নয়ন সাধিত হয়। সংস্কৃতি দূর করে মানুষের মনের ক্ষুধা আর অর্থনীতি দূর করে পেটের ক্ষুধা। মনের ক্ষুধা আর পেটের ক্ষুধামুক্তির সম্মিলিত প্রয়াসেই সৃষ্টি হয় প্রকৃত ক্ষুধামুক্তি। সংস্কৃতির যথাযথ বিকাশ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতি ভবিষ্যতের বাংলাদেশে দেখতে চাই।

"বাংলাদেশ যৌথ সংস্কৃতির দেশ। এখানে আছে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ—আছে বাঙালি এবং অর্ধশতাধিক আদি নৃ-গোষ্ঠীর মানুষ। সংস্কৃতির বহুত্ব এবং বৈচিত্র্য পৃথিবীর বুকে বাংলাদেশকে একটি অনন্য অবস্থানে নিয়ে গেছে। মিলিত বাঙালির সম্প্রীতিময় বন্ধন আমাদের জাতিসত্তার গৌরবিত বৈশিষ্ট্য। অথচ নানা সময়েই দেখা গেছে ধর্মান্ধ ব্যক্তি বা দল, কখনো বা রাষ্ট্র-পরিচালনাকারী স্বয়ং, ধর্মীয় প্রভেদ সৃষ্টি করে মিলিত সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে, সৃষ্টি করতে চেয়েছে মানুষে–মানুষে ধর্মে-ধর্মে ভেদ। ধর্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর এমন হীন ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত থাকবে আমাদের ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ। আগামীর বাংলাদেশ হবে প্রকৃত অর্থেই এক সম্প্রীতির দেশ। মানুষ স্বাধীনভাবে যার যার ধর্ম পালন করবে স্বপ্নের বাংলাদেশে। ধর্ম স্বার্থান্ধ দল বা গোষ্ঠী দ্বারা ব্যবহৃত হবে না, রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের প্রয়োজনে ধর্মকে নিজেদের মতো ব্যবহার বা ব্যাখ্যা করবে না, 'লালসালু'র মজিদের মতো কোনো ব্যক্তি ধর্মকে ব্যবহার করবে না ভন্ডামির উৎস হিসেবে— এমনি স্বপ্ন দেখি আমি।"[২]

সুষ্ঠু মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন জাতি বিকাশের ক্ষেত্রে দরকার পরিমিত পুষ্টিকর খাবার, সুপেয় পানীয় জল এবং নৈতিক শিক্ষায় শিক্ষালাভ। বাংলাদেশে আজ ভেজাল খাবারের ছড়াছড়ি। শাকসবজি থেকে শুরু করে ফলমূল, মাছ, গোশত সর্বত্রই যেন কার্বাইড আর ফরমালিনের রাজত্ব। আমি স্বপ্ন দেখি ফরমালিন মুক্ত বাংলাদেশের– যেখানে নৈতিকতাবোধ সম্পন্ন, মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন মানুষ তৈরি হবে-যারা সচেতনভাবেই খাবারে এবং পণ্যে ভেজাল মিশ্রিত করবে না। গড়ে উঠবে নৈতিক শক্তিতে সমৃদ্ধ জাতি-গড়ে উঠবে মানবিক বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনেক দূর এগিয়েছে, এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও রাজনৈতিক ক্ষমতার পট পরিবর্তনের মাধ্যমে ইতিহাস বিকৃতির মহোৎসব সৃষ্টি করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহান স্বাধীনতার ঘোষক, প্রথম রাষ্ট্রপতি, বাঙালির মহানায়ক, বাঙালি জাতির জনক—এসব নিয়ে প্রশ্ন তোলা বাংলাদেশকে অস্বীকার করারই নামান্তর। বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের গভীর রাতে (২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে) বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণা "This may be my last message, from today Bangladesh is independent. I call upon the people of Bangladesh wherever you might be and with whatever you have, to resist the army of occupation to the last. Your fight must go on until the last soldier of the Pakistan occupation army is expelled from the soil of Bangladesh and final victory is achieved."[৩] (বাংলাদেশ সংবিধান, ষষ্ঠ তফসিল, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ)

মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি সুকৌশলে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করেছে। ইতিহাস বিকৃতির এই ইতিহাস বিভিন্ন সময়ে সংঘটিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস জেনে নিজেদের সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলবে, মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী প্রজন্ম বিকৃত ইতিহাস চর্চা করবে না—ভবিষ্যতে রাজনৈতিক ক্ষমতার পট পরিবর্তন হলেও ইতিহাস বিকৃতির কোনো ইতিহাস সৃষ্টি হবে না—এমনই বাংলাদেশ চাই আমরা, যেখানে প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো যথাযথ রাজনৈতিক সংস্কৃতির চর্চা করবে। প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো ভবিষ্যতে রাষ্ট্রপরিচালনা করবে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির

---

২ ঘোষ বিশ্বজিৎ (২০১৮), ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনা (সম্পাদিত) গ্রন্থকুটির, ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২৮।

৩ (বাংলাদেশ সংবিধান, ষষ্ঠ তফসিল, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ)

সাথে প্রগতিশীল শক্তিগুলো রাজনৈতিক আঁতাত করবে না। প্রগতিশীল শক্তি দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংস্কৃতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে এমন একটি বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই। রাজনৈতিক দলগুলো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় প্রকৃত অর্থেই গণতান্ত্রিক সংস্কৃতিসমৃদ্ধ রাজনৈতিক দলে রূপান্তরিত হবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশে। আজ কথায় কথায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা বলা হয়। 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' বলতে কী বোঝায়? সে সম্পর্কে অনেকেরই স্বচ্ছ ধারণা নেই। জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এই চারটি নীতিই রাষ্ট্রপরিচালনার মূল ভিত্তি। বাংলাদেশ সৃষ্টির পেছনেও মূলভিত্তি ছিল এই চারনীতি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা মানেই এই চার মূলনীতি। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে হত্যা করা হয়েছে বাংলাদেশকেই। এই হত্যার মধ্য দিয়ে ঘাতকের নির্মম বুলেট মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকেই হত্যা করেছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যারা সপরিবারে হত্যা করেছিল, সেই হত্যাকারীদের মধ্যে অনেকের ফাঁসি কার্যকর হয়েছে। একজন খুনি জিম্বাবুয়েতে মারা গেছে, একজন আমেরিকা এবং অন্য আরেকজন কানাডাতে রাজনৈতিক আশ্রয়ে আছে। বাকি খুনিদের ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকারের কাছে সুস্পষ্ট কোনো তথ্য নেই। ভবিষ্যতে বঙ্গবন্ধুর সকল খুনিদের ফাঁসির মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ কলঙ্কমুক্ত বাংলাদেশ আমি দেখতে চাই। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশে যে কলঙ্কিত ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যেন বাংলার মাটিতে আর সংঘটিত না হয়, এমন একটি বাংলাদেশ আমাদের স্বপ্ন।

১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় যারা বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিপক্ষে ছিল তাদের অনেকেই পরবর্তীতে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছে। বাংলাদেশের পতাকা গাড়িতে লাগিয়ে বাংলার মাটি, আকাশ এবং বাতাসকে কলঙ্কিত করেছে। কলঙ্কিত করেছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি এই দেশে আর ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে পারবে না, যারা বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে সেই মানবতাবিরোধী শক্তি বাংলার মাটি থেকে চিরতরে নস্যাৎ হবে, প্রগতিশীল শক্তি পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হবে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হিসেবে বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে—এমনই এক বাংলাদেশ সবার প্রত্যাশা।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি আজ সারাবিশ্বে রোল মডেল। এ দেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান খাত হলো তৈরি পোশাক শিল্প। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ এই খাত থেকে আসে। তৈরি পোশাক শিল্পখাতের দৃশ্যমান অগ্রগতি হলেও এই খাতে কর্মরত শ্রমিকদের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এখনো পুরোপুরি সম্ভব হয়নি। আজও অনেক ক্ষেত্রেই পোশাক শ্রমিকদের বেতন আর বোনাসের জন্য রাস্তায় আন্দোলন করতে হয়। স্বাধীনতার প্রায় পাঁচ দশক পরেও এটি আমাদের জন্য দুঃখজনক। তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন হবে, স্বাস্থ্য ও বাসস্থান সুবিধাসহ তাঁরা উন্নত জীবন পাবে, তাঁদের হাত ধরে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা আরও বেগবান হবে—এমন একটি বাংলাদেশ আমরা দেখতে চাই।

যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। মেগা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে বাংলাদেশকে আর দাতা সংস্থা বা দাতাদেশগুলোর ওপর নির্ভর করতে হয় না। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব সক্ষমতা প্রমাণ করে। কিন্তু স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের বিমান ও রেলখাত অব্যাহতভাবে লোকসানের সম্মুখীন হচ্ছে। যোগাযোগের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও অগ্রগতি অর্জন করবে এবং সেই দক্ষতা বাংলাদেশের আছে। শুধু পদ্মা সেতুর দ্বারাই বাংলাদেশের জিডিপি প্রায় ১.২৩ শতাংশ বেড়ে যাবে, যা আমাদের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকেই নির্দেশ করে। ভবিষ্যতের বাংলাদশে যোগাযোগের সকল ক্ষেত্রে বিশ্বমানের যোগাযোগ ব্যবস্থা তৈরি হবে এমনই স্বপ্ন আমরা দেখি।

কোনো দেশের মানুষ অর্থনৈতিকভাবে কতটা উন্নত তা সে দেশের মানুষের স্বাস্থ্য দেখলেই অনেকটা অনুমান করা যায়—এমন ধারণাই অনেকে পোষণ করেন। এটি সত্য কি মিথ্যা, তার বাস্তব কোনো ভিত্তি না থাকলেও এটি যে অনেকাংশে সত্যি—এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বাংলাদেশের চিকিৎসাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যখাত বিশ্বমানের বা যুগোপযোগী কি না তা নিয়ে যথেষ্ট বির্তক হতে পারে। তবে যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চিকিৎসাব্যবস্থা এবং স্বাস্থ্যখাতের চিকিৎসাসেবা এগিয়ে যাচ্ছে এটি নির্দ্বিধায় বলা যায়। রাষ্ট্রের সব নাগরিক উন্নত স্বাস্থ্যসেবা পাবে, কোনো মানুষ বিনা চিকিৎসায় কষ্ট পাবে না—এমনটাই দেখতে চাই আমাদের ভবিষ্যতের বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের উন্নয়নযাত্রায় নারীরা অসামান্য অবদান রাখছেন। এ দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়ন বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। বিশেষ করে ক্ষুদ্র ঋণ এবং তৈরি পোশাক শিল্পের মাধ্যমে নারীরা তাদের সীমাবদ্ধ গণ্ডি পেরিয়ে উৎপাদনমুখী কর্মকাণ্ডে নিজেদের সম্পৃক্ত করছে। গ্লোবাল জেন্ডার ঘ্যাপ রিপোর্ট ২০২০-এ বাংলাদেশ ১৫৩টি দেশের মধ্যে ৫০তম স্থানে অবস্থান করছে। বাংলাদেশে উঁচু স্তরে নারীর সমৃদ্ধ ক্ষমতায়ন চোখে পড়লেও তৃণমূল পর্যায়ে নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পিছিয়ে রয়েছে। আমরা এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই, যেখানে নারীর পূর্ণ ক্ষমতায়নের মাধ্যমে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ এবং লিঙ্গসমতা অর্জিত হবে এবং বাংলাদেশ হবে নারী ক্ষমতায়নের মডেল।

অর্থশাস্ত্রের জনক কৌটিল্যের মতে, "শিক্ষা হলো শিশুকে দেশ বা জাতিকে ভালোবাসার প্রশিক্ষণ দেওয়ার কৌশল।" বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, "তাকেই বলি শ্রেষ্ঠ শিক্ষা, যা কেবল তথ্য পরিবেশন করে না, যা বিশ্ব সত্তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আমাদের জীবনকে গড়ে তোলে।" গান্ধিজি শিক্ষা নিয়ে বলেছেন, "ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সুষম বিকাশের প্রয়াস।" ব্যাপক অর্থে বলা যায়, শিক্ষা হলো একটি জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া, যা মানুষের আচরণের পরিবর্তন, মূল্যবোধের বিকাশ এবং উদারনৈতিক মনোভাব গঠনে সহায়তা করে। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে দরকার সৃজনশীল ও জীবনমুখী শিক্ষা, যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সুনাগরিক হিসাবে গড়ে উঠবে। জ্ঞানার্জন এবং জ্ঞান সৃষ্টিই হবে সেই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন, "জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।" তাই আমরা এমন একটি বাংলাদেশ দেখতে চাই যেখানে শিক্ষা হবে জীবনমুখী এবং সেই শিক্ষা করবে না কোনো শিক্ষিত বেকার সৃষ্টি।

আগামীর বাংলাদেশে শিক্ষার্থীরা যথার্থই শিক্ষার্থী হয়ে উঠবে। শিক্ষাব্যবস্থা হবে প্রযুক্তিনির্ভর, বিজ্ঞানসম্মত, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধসম্পন্ন এবং সময়োপযোগী। এরই মাধ্যমে বিকশিত হবে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভা। সেই শিক্ষা অর্জন করে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম প্রকৃত মানবসম্পদে রূপান্তরিত হবে, যা অর্থনৈতিক উন্নয়ন আর অগ্রগতিতে এক নতুন মাত্রা যোগ করবে। জ্ঞানার্জন, নৈতিকতাবোধ সৃষ্টি, কৃষ্টি চেতনা উন্মেষ, চরিত্র গঠন এবং সৃষ্টিশীল মানুষ হিসাবে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে তৈরি হবে সম্ভাবনার এক অন্য বাংলাদেশ, যেখানে থাকবে না শ্রেণি ভেদাভেদ, জাতি-ধর্ম-বর্ণে সৃষ্টি হবে না কোনো বৈষম্য—সর্বোপরি সৃষ্টি হবে এক শোষণহীন গণতান্ত্রিক সমাজ।

বর্তমান যুগ হলো তথ্যপ্রযুক্তির যুগ। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ সফলতার সাথে মোকাবিলা করতে হলে তথ্যপ্রযুক্তির বিকল্প নেই। সময়ের সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অগ্রগতিতে আমাদের জীবনধারায় পরিবর্তন এসেছে। আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পাদপ্রান্তে অবস্থান করছি। তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে ই-শিক্ষা,

গ্রিন ব্যাংকিং, ই-বিজনেস, মোবাইল নেটওয়ার্ক 4G-তে উন্নীতসহ অনেকক্ষেত্রে বাংলাদেশ অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার করে অনেক ক্ষেত্রেই জনমনে বিভ্রান্তি তৈরি এবং সাইবার ক্রাইম সংঘটিত হচ্ছে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে নিজেদের তৈরি সফটওয়্যার ব্যবহৃত হবে, তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার রোধ হবে এবং আগামীর বাংলাদেশ হবে উন্নত তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এমনই স্বপ্ন আমার।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল একটি সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা। তালগাছ যেমন মাটিকে আঁকড়ে ধরে সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি আমরা যদি বাঙালিত্বকে ধারণ করে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে আবর্তিত হই—তাহলে বিশ্বের বুকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকবে বাংলাদেশ। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনায় আমাদের প্রত্যাশা—আগামীতে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষেত্রে চার মূলনীতির (জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা) মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ভিত্তি হিসাবে বিবেচনা করা হবে—বাস্তবায়ন হবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক চেতনার। বঙ্গবন্ধুকে কেন্দ্র করে আগামীর বাংলাদেশে সকল অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে—এর মাধ্যমে কবিগুরুর 'তালগাছ' কবিতার মতো সবকিছু ছাড়িয়ে বাংলাদেশ আত্মপ্রকাশ করবে উন্নত সমৃদ্ধ অর্থনীতির দেশ হিসেবে—গড়ে উঠবে বঙ্গবন্ধুর বহুল আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ।

গ্রন্থপঞ্জি

ঘোষ বিশ্বজিৎ (২০১৮), ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ ভাবনা (সম্পাদিত) গ্রন্থকুটির, ঢাকা।

বাংলাদেশ সংবিধান, দ্বিতীয় ভাগ, অনুচ্ছেদ-১৯, ধারা-০২

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা-২০১৯

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২১

বাংলাদেশ সংবিধান, ষষ্ঠ তফসিল, ১৫০ (২) অনুচ্ছেদ

Global Gender Gap Report-2020